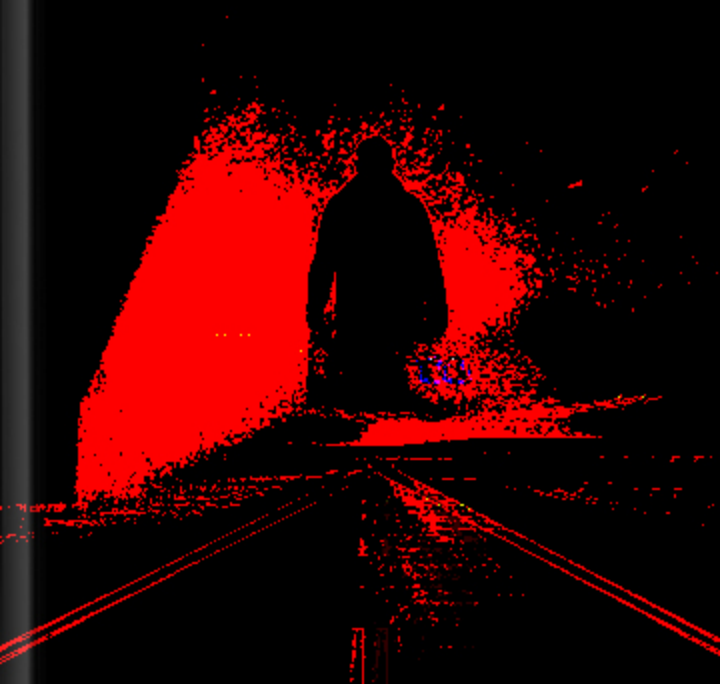


হাইওয়ে রোডের মধ্যরাত

কিসিঞ্জার ভূঁইয়া





কিসিঞ্জার ভূঁইয়া

হাইওয়ে রোডের মধ্যরাত



দ্বিতীয় বইঘর সংস্করণ
জুন, ২০২৪

ই-বুক প্রকাশক
বইঘর
ই. বি. সল্যুশন্স লিমিটেড

হাইওয়ে রোডের মধ্যরাত কিসিঞ্জার ভূঁইয়া



উৎসর্গ

রাতের নির্জনতা

ও

যে আমাকে প্রায়ই ভূতের ভয় দেখায়



সূচিপত্র

হাইওয়ে রোডের মধ্যরাত

ভূতের ভয়

বিড়িখোর ভূত

মধ্য রাতের ছাগল

ভয়ংকর ভূত

বাঁশঝাড়ের পেত্নি

পোড়াবাড়ির পেত্নি

রাঙামাটির ভূত

ভূতের আগমন

কক্ষ নং এক'শ তেরো

দেয়ালে ভূত দেখা

আজব ভূত

জলের ভূত

হাইওয়ে রোডের মধ্যরাত

কক্স'স বাজারের উদ্দেশে রওনা দেয় লিমন। গাড়ি চলছে আপন গতিতে। চালক সে নিজেই। ফাঁকা রাস্তা। রাতের যাত্রা বেশ আরামদায়ক হয় যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। আজ রাতের আবহাওয়া মোটামুটি ভালো হলেও অমাবস্যার রাত। চারিপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার দু'পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলো মিটমিট তারার মতো জ্বলছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে শীতও বেড়ে যাচ্ছে। কনকনে শীত। হেডলাইটের আলোতে কুয়াশা ছেদ করে গাড়িটি সামনের দিকে এগোচ্ছে। চলতি পথে হঠাৎ করে তার মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। বউ সামিয়ার কল! বউয়ের নির্দেশ মানতে গিয়ে কলটা আর ধরা হলো না। বউয়ের কথা হলো, যে কেউয়েরই ফোন আসুক না কেন গাড়ি চলন্ত অবস্থায় রিসিভ করা যাবে না। এতে যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাড়ি থামানো ছাড়া উপায় নেই। একটু সামনে রাস্তার পাশে ঝোপঝাড় মতো একটি জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করালো লিমন।

দূরপাল্লার কিছু গাড়ি দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। কোনো জনমানবের কোলাহল নেই। শীতের রাতে অবশ্য এখানে কেউ ঘোরাফেরা করার কথা না। কেউ কেউ হয়তো বা কন্সল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। কেউ বা হয়তো চায়ের চুমুকে গা গরম করে নিচ্ছে।

-হ্যালো সামিয়া! তখন তোমার ফোনটা রিসিভ করতে পারিনি। গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম। এখন অবশ্য একটা জায়গায় পার্কিং করে দাঁড়িয়েছি।

-কোথায় এখন?



-এইতো মনে হচ্ছে কুমিল্লা পার হয়ে এসেছি। এমন একটা জায়গা যেখানে দু'ধারে ঘন বন, আশেপাশে কোনো দোকানপাটও নেই। অনেকটা দূরে একটা ইটের ভাটার মতো দেখা যাচ্ছে। চারপাশ ঘন অন্ধকারে গ্রাস করছে। কোথায় থেকে যেন মিষ্ট একটা গন্ধ ভেসে আসছে। হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাসের শব্দে কান বন্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থা। মনে হয় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে আসছে। ভাগিয়ে মোটা জ্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে আসছিলাম। তা না হলে তো এখানে টিকায় যেত না। ঠান্ডায় এতোক্ষণে বরফ হয়ে যেতাম।

-সামিয়া বললো, তুমিতো কোথাও একা থাকলে বিশেষ করে রাতের বেলায় ভূতের ভয় পাও। এখনও কি পাচ্ছে?

-গা ছমছম করছে! জঙ্গল থেকে একটা চিকন নাকি স্বর ভেসে আসছে। 'কেঁ ওঁখানে? পাঁলা ওঁখান থেঁকো।'

-সামিয়া বললো, তাহলে তুমি একটা কাজ করো। কল কেটে দাও। গাড়িটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। দেখো কোথাও কোনো বাজার অথবা জনমানব আছে কিনা? আমাকে পরে কল দিও।

লিমন তখন গাড়ি নিয়ে একটু সামনের দিকে যেতেই দেখতে পায় রাস্তার মাঝখানে একটা মাইক্রো বাস চাকা খুলে পরে আছে। বেশ ক'জন লোকও দেখা যাচ্ছে। লিমন নিরুপায় হয়ে গাড়িটা ঐ ভিড়ের পাশে পার্ক করে। কারণ সামনে যাওয়ার রাস্তাতো মাইক্রোবাস আর লোকজনের এলোমেলো অবস্থার কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। এখানে তাদের না সরিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে একসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া ঘটনা কি ঘটেছে সেটা না জেনে কি আর যাওয়া যায়। লিমন তার গাড়ি পার্ক করে ভিড়ের দিকে ছুটে চলে। এর মধ্যে একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারে গাড়ি একসিডেন্ট করেছে। তেমন কোনো ব্যথা কেউ পায়নি।

-আপনি কি চট্টগ্রাম যাচ্ছেন জনাব? ওখানের একজন জিজ্ঞেস করে।

-লিমন বলে চট্টগ্রাম বলতে কক্স'স বাজার যাচ্ছি।

-ও তাহলে তো খুব ভালোই হলো। আমাদের চকরিয়ায় যাওয়ার কথা। কিন্তু গাড়িটার অবস্থা ভয়াবহ। ঠিক করতে টাইম লাগবে। তাছাড়া এখানে আশেপাশে কোনো গ্যারেজও নেই। তারপরও দেখা যাক কি করা যায়। আমরা পুরুষ লোক ক'জন না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তো গাড়ির মালিক আপাকে নিয়ে। তাকে যদি একটু লিপট দিয়ে চকরিয়া নামিয়ে দিতেন তাহলে খুবই উপকার হতো।

লিমন কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো যে, আসুন আপা। গাড়িতে উঠুন। হঠাৎ করে তার কাছাকাছি আসতেই লিমন তাকে স্পষ্ট করে দেখে আঁতকে উঠে! এতো দেখি যুবতি নারী। দেখতেও বেশ সুন্দরী। তাকে নিয়ে আবার কোন কেলেঙ্কারীই বা ঘটে। একটা যুবতি মেয়েকে সে একা একা চকরিয়া নিয়ে যাবে ভাবতেই তার গা কেমন জানি করে উঠে। কিন্তু লিমন হঠাৎ করে সামনে তাকিয়ে দেখলো ঐ যুবতির সাথের লোকগুলো তাদের গাড়িটাকে মাথার উপর উঠিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। আর যখন তার মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে যুবতিকে ভালো করে দেখতে গেলো তখন তার গা ছমছম করে উঠলো! সে ভয় না পেয়ে সাহস করে মেয়েটাকে রেখেই গাড়ির ভিতর ঢুকে খুব স্পীডে চালাতে শুরু করলো। সর্বোচ্চ স্পীড। যেন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার গন্তব্যে চলে যাবে। লুকিং গ্লাসে দেখতে পেলো ঐ মেয়ে সহ তার সাথের লোকজন লিমনের গাড়ির পেছন পেছন দৌড়ে তাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর তারা হাওয়া হয়ে গেলো। লিমন ভাবতে লাগলো এরা আবার কারা? ভূত-পেঙ্গি নাকি?

অনেকটা রাস্তা পারি দিয়ে লিমন সামনে দেখতে পেলো একটা দোকান। তার পাশে গাড়িটা পার্ক করে। শৈত্যপ্রবাহের রাতেও লিমনের শরীর ভয়ে ঘেমে যায়। ঘর্মাক্ত অবস্থায় দোকানের কাছে দাঁড়ালো।

দোকানওয়ালা বললো, স্যার কিছু খাবেন? সিগারেট খাবেন? কোল্ডড্রিংকস খান একটা।

-লিমন সাথে সাথে কোনো কথা বললো না। সে ভাবলো এই ঠান্ডার মধ্যে আবার কোল্ডড্রিংকসের অফার! দোকানওয়ালার মাথা ঠিক আছে তো?

-কোনো সমস্যা স্যার? আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

-লিমন বললো, না ক্লান্ত না ঠিক। একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এসেছি।

-আমাকে খুলে বলুন ব্যাপারটা। কি ঘটেছে?

-ভূত দেখার মতো অবস্থা। মনে হয় ভূত-পেঙ্গিই হবে। আজব ব্যাপার ঘটে গেছে।

-তা দেখতেও পারেন। এই এলাকাটা খুব একটা ভালো না। অনেকে ঐ রাস্তায় এসে গাড়ির সামনে হঠাৎ করে সাদা ঘোমটা পরা ভূত দেখে আঁতকে উঠে! অনেকে ভয়ে গাড়ির ব্যালেন্স না রাখতে পেরে একসিডেন্ট করে বসে।

-লিমন দোকানওয়ালার কাছে পুরো ঘটনাটা বলার চেষ্টা করছে। দোকানওয়ালার কাছে একটা সিগারেট চেয়ে লিমন আবার বলতে শুরু করলো। আমি যখন যুবতিকে গাড়িতে উঠতে বলে লুকিং গ্লাসের দিকে তাকালাম তখন আয়নায় আমার এক বান্ধবীকে দেখতে পেলাম, যাকে আমি চিটাগাংরোড নামিয়ে দিয়ে আসছি। সে যাবে আদমজী নগর। আর যখন গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে মোবাইলের আলো জ্বালালাম এবং তার মুখ বরাবর ধরলাম তখন তাকে একজন বিশিষ্ট বৃদ্ধা মহিলা মনে হয়েছে। তার আবার হাত দুটোও উল্টো দেখা যায়। পিঠের দিকে ফিরানো। আপনিতো নিশ্চয় বুঝতে

পারছেন ঘটনাটা কেমন ভয়াবহ ঘটেছে! এসব কথা বললে কেউ কি বিশ্বাস করবে বলেন ভাই?

দোকানওয়ালা বললো, আর কে বিশ্বাস করবে কি করবে না তা জানি না। তবে আমি জানি এই এলাকাতে ভয়ংকর ভূত-পেঙ্গি থাকে। ভাগ্যিস আপনি আপনার সাহসের জোড়ে বেঁচে গেছেন। তা না হলে হয়তো আপনাকে একটু ঘাড় মটাকানোর চেষ্টা করতো। সমস্যা নেই স্যার, আপনি ইচ্ছে করলে আজকের রাতটা আমার দোকানেই থেকে যেতে পারেন।

লিমন বললো, না তা আর দরকার হবে না। যাক, আপনার বিল কত হলো। আমি বরং আজ রাতের মধ্যেই চলে যাই।

-জি স্যার দুটো সিগারেট বিশ টাকা আর কফি ত্রিশ টাকা মোট পঞ্চাশ টাকা দেন। স্যার সাবধানে যাইয়েন। এখন মধ্যরাত।

লিমন যখন বিল পরিশোধ করতে টাকা দিতে চাইলো তখন লোকটা তার বাঁ হাতটা বাড়ালো। ঠিক ঐ ভূতদের মতো উল্টো হাত। লিমন ভয়ে আঁতকে উঠে। কোনো রকম গাড়ির দরজা খুলে গাড়ি স্টার্ট দিলো। সে শীতের মধ্যে ঘামতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পথ যাওয়ার পর সে কিছুটা শান্ত হয়। লুকিং গ্লাসে পিছনের দিকটা দেখলো। না কেউ নেই। নেই কোনো দূরপাল্লার গাড়িও। চারিপাশ নিরবতায় ঘিরে রয়েছে। লিমন একাই গাড়ি চালাচ্ছে। আজ একটা কঠিন বিপদ থেকে বাঁচলো। চলতে চলতে অনেকটা চকোরিয়ার কাছাকাছিই চলে আসলো।

তার বান্ধবীর সাথে ফোন করে কথা বললো। সে ঠিক মতো বাসায় পৌঁছেছে কিনা? তার কাছে পুরো ঘটনাই বললো। বান্ধবীও শুনে অবাক হলো। কথা শেষ করে লিমন তার গন্তব্যে পৌঁছাতে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। চকোরিয়া যেতে যেতে ভোর হয়ে গেলো। সেখানের একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা পার্কিং করলো। হোটেলের ভিতর



প্রবেশ করে ফ্রেশ হয়ে নিলো। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। পরোটা সবজি দিয়ে সকালের নাস্তাটা সেড়ে নিলো। তার পর একটা গরম কপি খেয়ে শরীরটা সতেজ করে নিলো। রাতে বেলা যে দখল গেছে ভাবতেই গা শিউরে উঠে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লিমন আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলো। সকালের হাওয়ায় ঠান্ডা কিছুটা কমে গেছে। কুয়াশাও অনেকটা কেটে গেছে। পাহাড়ি রাস্তার দু'পাশের প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মন ভরে যাচ্ছে। শান্তি ফিরে আসছে।



ভূতের ভয়

এক

বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলো আশিক। সড়কের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। আশেপাশেও কোনো বাড়ি ঘর নেই। তখন সন্ধ্যা বেলা। সড়কের ধারে একটা ঝোপের ভিতর থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে এলো। আশিক ভয় পেয়ে গেলো। চিৎকার দিলো কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বের হলো না। হঠাৎ সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা লম্বা মতো মানুষ তার কাছে বিড়ি ধরানোর জন্য একটা ম্যাচ চাইলো। আশিক তখন শান্ত বলে জোড়ে চিৎকার দিলো এবং মনে মনে একটা সূরা পাঠ করে ফুঁ দিলো। তারপর তাকিয়ে দেখে মানুষবেশী ভূত আর নেই।

দুই

আশিক বাড়ি আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেলো। প্রায় দশটা বেজে গেলো। আসতে না আসতেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর বিদ্যুৎ চলে গেলো। সারা ঘর অন্ধকার হয়ে পড়লো। বাইরে ঝড়ের ঝাপটা শুনা যাচ্ছে। বিজলি চমকাচ্ছে। ঝড়ে বিদ্যুতের খুঁটিও বেশ ক'টা ফেলে দিয়েছে। ট্রান্সমিটার ব্রাস্ট হয়ে গেছে। রাতে আর বিদ্যুৎ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আশিক ঘরে একা। তার মা মফস্বল শহরে গিয়েছে একটা কাজে। ফিরতে ফিরতে আগামী কাল। তাই আশিক তার চাচাতো ভাই রাজুকে ফোন দিলো তার সাথে থাকার জন্য। তারা দুজন এক সাথেই বড় হয়েছে। বন্ধুর মতোই। আশিক ভাবছে সারা রাত গল্প করেই কাটিয়ে দেবে। বাইরে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় রাজুর আসতে একটু দেরি হচ্ছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বেড রুমে মোমবাতি জ্বালাল আশিক। ঝড়বৃষ্টি দেখার জন্য একটা জানালা খুলে দিল। ঠান্ডা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলো। বাতাসের ঝাপটায় মোমবাতিটা নিভে গেলো। অন্ধকারে ভয় পেয়ে গেলো আশিক। সে ভাবতে লাগলো রাজু আসার পরই আবার মোমবাতি ধরাবে। সে পর্যন্ত বৃষ্টির ফোঁটার স্পর্শ নিয়ে আনমনা হয়। কিন্তু হঠাৎ বিজলি চমকিয়ে বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ হলো কোথায় যেন! আর ভয়ে আশিকও মেঝেতে পড়ে গেলো। একটু পরে উঠে বসলো সে।

তিন

কিছুক্ষণ পর আশিক বুঝতে পারছিলেন সে কোথায় আছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো কিনা কে জানে! রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে। বাইরে বৃষ্টির ফোঁটা এখনো বিদ্যমান। মধ্যরাত বলে কথা। জঙ্গলের আশেপাশে কয়েকটা শেয়াল জোরে জোরে ডাকছে। আশিক ভয়ে তার চোখ বুজে আছে। মাথাটা বেশ ভার ভার লাগছে। তার পিছনে কে যেন আসছে। আলো থাকলে হয়তো তার ছায়া দেখা যেত। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে কি যেন তার কাছে আসছে বলে মনে হচ্ছে। আশিকও চোখ তুলে তাকালো। আবার খসখস আওয়াজও হচ্ছে। ভয় পেল আবার মনে করলো বিড়ালটিরাল হবে হয়তো। একটা অদ্ভুত গোঙানির স্বর শুনতে পেল সে। এবার তার গা শিউরে উঠলো। ভয়ে



কাঁপতে লাগলো। চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার মুখ থেকে কোনো স্বর বের হচ্ছে না। মিষ্ট গন্ধও লাগছে তার নাকে।

চার

আশিকের মনে হলো তার পেছনে কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। সে পিছন ফিরে তাকালো। আঁধারের মধ্যে শুধু তার বড় বড় চোখ দুটিই দেখতে পেলো। ভয়ে কাঁপতে লাগলো আশিক। ভূত-পেত্ৰি হবে হয়তো। তা না হলে দরজা বন্ধ অবস্থায় এটি আসলোই বা কীভাবে? আশিক মুহূর্তে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

খুব একটা সময় পোলো না আশিক। গোঙানির স্বরে আশিকের কাছে আসলো পেত্ৰিটা। দাঁত বের করে হাসতে লাগলো এটি। আশিক ভয়ে চিৎকার দিতে চাইলো কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হলো না। এর মধ্যে আবার দরজায় টোক টোক আওয়াজ শুনতে পেল আশিক।

পাঁচ

কোনো রকমে দরজাটা খুলতেই তাড়াহুড়া করে ঘরে প্রবেশ করলো রাজু। ঝরঝট্টির রাত। ভিজে ঝবুতবু হয়ে গেলো রাজু। কি ব্যাপার! বিদ্যুৎ নেই আশিক? অতঃপর মোবাইলের টর্চটা জ্বালালো আশিক। তখন গভীর রাত। রাজুর উপস্থিতিতে আশিকের কিছুটা ভয় কাটলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজু ভেজা পোশাক পরিবর্তন করে নিলো।

বিষয়টা রাজুর কাছে খুলে বললো। কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন আর কিছুই খুঁজে পেলো না। অতঃপর আশিক চায়ের ব্যবস্থা করার জন্য রান্না ঘরে গেলো।

ছয়

বারান্দার বেঞ্চটায় এসে বসলো দুজন। দু'কাপ চা নিয়ে গল্প করতে বসলো। মোবাইলের টর্চ জ্বলছে। ভূত আর ভয় নিয়েই তাদের মূল আলোচনা। কিছুক্ষণ আগে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেলো। রাজু বললো, আসলে এটা ভূত নাও হতে পারে। অনেক সময় মৃত মানুষও অন্ধকারে দেখতে আসে কে কি করছে! কোনো সমস্যা আছে কিনা!

রাজুর এসব কথা শুনে আশিক আরও ভয় পেতে লাগলো। রাজু বললো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখনতো আমি আছি সাথে। তাই না? আজ মনে হয় সারা রাত ভয়ে ঘুমই হবে না। রাজু বললো, এমন ঘটনা আমি আরো অনেক শুনেছি বাবার কাছে থেকে। আমার বাবা একদিন খালিয়াজুরির একটা রাস্তা দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। বাবা তখন গ্রামীণ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। কিস্তি নিয়ে ফিরছিলেন। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলো। কাঁচা মাটির সড়কের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। কখনো কখনো আবার কোনো একপাশে বড় হাওড়ও দেখা যায়। জায়গাটা খুবই ভয়ংকর। লোকমুখে শুনেছে, ঐ জায়গাগুলোতে নাকি ভূত-পেঙ্গি রাস্তা অবরোধ করে লোকজনকে ঘাড় মটকায়। যাইহোক, ফিরার পথে সড়কের মাঝখানে এক লোককে হাত নাড়তে দেখলেন বাবা। কাছে এসে দেখেন জমির উদ্দিন স্যার। হঠাৎ প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যে তাকে দেখে একটু অবাক হলেন বাবা! জমির উদ্দিন সাহেব বাবাকে বললেন, এত রাতে এই পথ দিয়ে যাওয়াটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। তুমি বরং হাওরের পথ দিয়ে যাও। এতে তোমার জন্য

ভালো হবে। বাবা জমির উদ্দিন সাহেবের থেকে একটু আগে পা বাড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন তিনি আর নেই। কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন।

বাবা বাসায় ফিরে এসে পরদিন পত্রিকা খুলে দেখলেন, উনি গত রাতে যে সড়ক দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সেখানে ভূতে এক লোককে ঘাড় মটকে ফেলেছে। বাবা জমির উদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ জানালেন।

কিছুদিন পর বাবা তার এক বন্ধুর সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আলোচনায় ঐ রাতের বিপদের কথা বললেন। বাবার বন্ধু বললো, কি ব্যাপার! জমির উদ্দিন সাহেব আবার তোকে এ কথা বললো কি করে? উনি তো প্রায় দু'মাস আগে মারা গেছেন! এটা কি করে সম্ভব?

এসব গল্প আশিক ভয়ে ভয়ে শুনছে। তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে! গরমের মধ্যে কাঁপছে সে। রাজু এসব বুঝতে পেরে আরও ভয়ের গল্প বলতে শুরু করলো।

রাজু বলতে লাগলো। আমাদের বাড়ির পাশের যে সড়কটি কৃষ্ণপুরের দিকে গেছে, সেই সড়কে প্রায়ই গভীর রাতে সাদা পোশাক পরা লোক হাঁটতে দেখা যায়। লোকে মুখে শুনা। তারা নাকি মৃত লোক।

আবার পাশের জঙ্গলের বাড়িতে যে রশিদ চাচা থাকতো, সেই বাড়িতে রাতের বেলায় বাচ্চা পোলাপান হাঁটতে দেখা যায়। অনেকে এই বাড়ির ভিতর দিয়ে রাতে মাছ ধরার পর আসার পথে দেখতে পেয়েছে। ঐ বাচ্চাকে অনেকে আবার পরিচিত বলে বলছে। সে নাকি রশিদ চাচার নাতনি টুম্পি। সে অনেকদিন আগে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে মারা গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে এসব গল্প করতে গিয়ে রাজু নিজেও কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো। কারণ সেও একরাতে তার মৃত চাচাকে সাদা গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় কবরের কাছে দেখেছিলো। সে গভীর রাতে পাশের বাড়ি থেকে আসছিলো। এমন সময় হঠাৎ নজর কবরের দিকে। দেখতে পেলো এ ঘটনা।

সাত

দুজনের চা খাওয়া শেষে ভয়ে গল্পও থেমে গেলো। বজ্রপাতের বিকট শব্দে তারা হঠাৎ চমকে উঠে। ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। দুজনেই খানিক চুপচাপ।

হঠাৎ চে গুয়েবারার মতো ভরাট গলায় বললো- ওই, তুই কেডা? ভূত নাকি? তুই অন্ধকারে জিজ্ঞেস না করেই দরজা খুলে ভুল করেছিস। আমি ভূত! তুকে খাবো! তুই তারাতারি পালা। হা হা হা। পালিয়েও লাভ নেই। যেখানেই যাবি আমি তোকে আমার লম্বা হাত দিয়ে ধরে ফেলবো।

আশিক ভাবছে, তাহলে কি ভূত রাজুর বেশ ধরে ঘরে প্রবেশ করলো! মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পেলো আশিক। এখন কি করবে ভাবছে। রাজুকে কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আসলে সে হয়তো মানুষ নয়। ভূত! জঙ্গল থেকে হয়তো অন্ধকারে এসে পরেছে। রাজু বললো- আশিক তুই কি ভাবছিস আমি কিন্তু সব বুঝতে পারছি। এতে আশিক আরো ভয় পেয়ে গেল। তারপরও আশিক নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো।

আট

আশিক হঠাৎ রাজুকে রেখে দৌর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। পিছনে তাকিয়ে দেখলো রাজুও আসছে কিনা! আশিক দরজা লাগানোর পূর্বেই রাজুও ঘরে প্রবেশ করলো। রাজু বললো, আমাকে রেখেই দরজা লাগাতে চেয়েছিলে না! এত সহজ না।

মোবাইলের চার্জও প্রায় শেষের দিকে। যেকোনো মুহূর্তে লাইট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
আশিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

হঠাৎ আশিক পেত্রির মতো কণ্ঠে বললে- তুই কি ভাবছিস অন্ধকারের মধ্যে আমি
দরজা খুলেছি? দরজা নিজে নিজেই খুলে গিয়েছিলো। হয়তো দরজার সাথে কোনো
আধ্যাত্মিক শক্তি জড়িত।

এ কথা শুনে রাজুও চমকে উঠলো। সে ভাবলো তাহলে কি সে আশিক নয়। রাজুও
ভয় পেয়ে গেলো।

আশিকের কণ্ঠ থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এলো রাজুর কানে। আশিক
বলতে লাগলো ওই রাজু, আমি যে আশিক তুই ভাবলি কি করে! আমি এখন তুকে
খাবো। তুই কিন্তু পালাতে পারবি না।

নয়

রাজু ভয়ে কাঁপতে লাগলো। চিৎকার দিতে চাইলো কিন্তু গলা থেকে কোনো স্বর বের
হলো না। হালকা গোঙানির আওয়াজ বের হয়ে এলো। রাজুর এমন অবস্থা দেখে
আশিক বুঝতে পারলো যে, সে ভূত নয়, রাজু। রাজু সম্ভবত একটু ভয় দেখানোর জন্য
এমনটা করছে।

রাজুকে তারাতারি ধরে একটা চেয়ারে বসালো। চোখেমুখে একটু পানির ঝাপটা
দিলো। তারপর রাজু আশিকের দিকে তাকালো। আশিক তখন রাজুকে বললো, ভয়
পাইসিস না! আমি আশিক। তোর চাচাতো ভাই। অনেচ্ছন পর তাদের ডুল ভাঙলো।

দশ

দুজনে বসে আছে পাশাপাশি। হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ের কান্নার শব্দ শুনা গেলো। স্বরটা এলো রান্নাঘর থেকে। কিছুক্ষণ পর এক মহিলার গোঙানির শব্দ শুনতে পেলো ওরা। একে অপরকে ভয়ে জড়িয়ে ধরলো। হঠাৎ লম্বা ঠিক মহিলা মতন একজন একটা বাচ্চা কোলে করে রান্না ঘর থেকে বের হয়ে এলো। এলোমেলো চুল। বড় বড় চোখ। বাচ্চাটার চোখও বড় বড়। দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। লম্বা লম্বা হাত। মনে হয় দূর থেকে হাত বাড়ালেই ওদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। ওই ভয়ংকর মহিলা বাচ্চাটা নিয়ে আশিক ও রাজুর দিকে এগিয়ে আসছে এমন সময় মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় লাইট অফ হয়ে গেলো!

বিড়িখোর ভূত

ফোরকান আলী বাজার থেকে মাছ কিনে ফিরছিল। অনেক রাত তখন। দু'ধারে ঘন জঙ্গল। মাঝখানে কাঁচা রাস্তা। তিনি হাঁটছেন। হঠাৎ সামনে দেখলেন সাদা কাপড়ে ঢাকা একজন লম্বা মতো মানুষ। ফোরকান আলী তার কাছাকাছি এসে দেখেন মৌলানা শরীফউদ্দিন। তার পরিচিত। কিন্তু তিনিতো বেশ ক'বছর আগেই মারা গেছেন। তার বাবার কাছে শুনেছিলেন তিনি কামেল লোক ছিলেন। ভয়ে ভয়ে রাস্তার একেবারে পাশ দিয়ে হাঁটছেন ফোরকান আলী। পাশাপাশি মৃত শরীফউদ্দিনও। ফোরকান আলী মনে মনে ভাবছেন শরীফউদ্দিন যে ভাবে হাঁটছেন কখন আবার তার গায়ের সাথে ঘষা লেগে যায়! তার শরীর থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ ভেসে আসছে। হঠাৎ শরীফউদ্দিন তার কাছে একটা বিড়ি চাইলো। ফোরকান একটা বিড়িও দিল তাকে। ফোরকান আলী মনে মনে পালানোর উপায় খুঁজছে। এমন এক জায়গায় আছেন তারা যার আশেপাশে কোনো বাড়িঘরও নেই। চারদিক ঘন অন্ধকারে চেয়ে যাচ্ছে। পাশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের ডাক শুনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ রাস্তা হাঁটার পর সামনে একটা বাঁকের মতো জায়গায় যখন আসলেন কোথা থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এলো। ফোরকান আলী ভয়ে আঁতকে উঠলো। তার শরীর ঘেমে যাচ্ছে। বারবার বাড়ির কথা মনে পড়ছে। শরীফউদ্দিন বিড়ি টানছেন। ফোরকান আলীর হঠাৎ মনে পড়লো, ভূতপ্রেত দেখলে আয়াতুল কুরসি পড়তে হয়। ফোরকান আলী তাই করলেন এবং পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন মাওলানা শরীফউদ্দিন আর নেই। কিন্তু বিড়ির ধোঁয়া রয়ে গেছে এখনো। ফোরকান আলীর চোখে তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া। হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়ির কাছে চলে আসল। তাঁর গলার খাঁকর শুনে স্ত্রী কুপি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে ক্লান্ত ফোরকান আলী



একটা চেয়ারে বসলো। পুরো ঘটনা তার বউকে বললো। বউ বললো, যাক বাঁচা গেলো। তোমার কিছু হয়নি। আমার তো শুনেই গা কেমন শিউরে উঠলো। মুখোমুখি হলে তো অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। যাও গোসল করে নাও। ফোরকান আলী দেখল ধোঁয়াটা আর নেই। নিজের গা শুঁকে দেখে। এখনো বিড়ির গন্ধ। কিন্তু কোন বিড়ির গন্ধ এটা? শরীফ মাওলানার খাওয়া বিড়িটার গন্ধ নয় তো! ফোরকান আলীর চোখে আবার ধোঁয়া। এ ধোঁয়া সে ছাড়া কেউই দেখছে না।

মধ্য রাতের ছাগল

বজলের রহমান বাজার থেকে কাঁঠাল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। তিনি বাড়ির প্রায় কাছাকাছি। ঠিক তখনই তার পিছনে একটা ছাগল ভঁ্যা ভঁ্যা করে ছুটছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তেঁতুল গাছের পাশ দিয়েই রাস্তা। তিনি জানতেন তেঁতুল গাছের নিচে ভূত থাকে। ভূত সাধারণত পিছন থেকেই তাড়া করে। এর ব্যতিক্রম হলো না। তিনি মত্তবে পড়া আল্লাহর কালাম ঝপতে থাকেন। কিছু রাস্তা যাওয়ার পর ফুলবাবুর বাড়ি সামনে পড়ল। বজল হাঁক ছাড়লেন- ফুলবাবু... ফুলবাবু...! পিছন ফিরে দেখলেন ছাগলটি আর নেই। ফুলবাবুর কাছে ব্যপারটা খুলে বলল বজল। ফুলবাবু বললো- এই ঘটনা আমারও ঘটছে এক রাতে।

ফুলবাবু বললো, আমি এক রাতে তেলিগাতি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। আর হাঁটতে পারছিলাম না। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ সামনে দেখি একটি তেঁতুল গাছ। যাওয়ার পথে বাঁপাশের একটি টিলার মতো জায়গায় গাছটি। সেখানে গিয়ে একটা শিকরের উপর বসলাম। ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসলো। শরীরের ক্লান্তি কিছুটা দূর হলে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। জায়গাটা খুবই ভয়ংকর। রাস্তার দুপাশেই ঘন জঙ্গল। বাঁশঝাড়, তেঁতুল গাছে ভরা। রাতের অন্ধকারে একটা ভৌতিক পরিবেশ বিরাজমান। কিছু পথ আসলে হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন একটা ছাগল আমার পিছন থেকে ভঁ্যা ভঁ্যা ভঁ্যা করে ছুটে আসছে! গা ছমছম করে উঠলো। হায় হায় এতো রাতে আবার ছাগল আসলো কোথা থেকে? নিশ্চয় ভূত-পেঙ্গি হবে। আমি তখন কি করব বুঝে উঠতে না পেরে মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়ে ছাগলটার দিকে ফুঁ দিলাম আর ছাগলটা হাওয়া হয়ে গেলো! বাড়িতে

আসার পর বউ বললো, মাঝরাতে বাড়ির পিছনে একটা ছাগলের মতো ভঁ্যা ভঁ্যা স্বরে কান্না শুনে খুবই ভয় পেয়েছিলাম। এখন তুমি এসেছো বলে ভয় কেটে গেলো। তারপর বউয়ের কাছে ফুলবাবু তার ঘটে যাওয়া ভৌতিক ঘটনাটা খুলে বললো। বউ শুনে আঁতকে উঠলো এবং বললো এভাবে আর মাঝ রাতে একা একা বের হওয়া ঠিক হবে না। কারণ ছাগল সাধারণত রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বা জঙ্গলে অথবা তেঁতুল গাছের নিচে এভাবে থাকতে পারে না। আর যা ঘটেছে এতো ছাগলের নয় নিশ্চয় ছাগলরূপী ভূতের কাণ্ড!

ভয়ংকর ভূত

বহুদিন আগের কথা। রমিজ তার বাবার সাথে মামাবাড়ি থেকে ফিরছিল। প্রায় মধ্যরাত তখন। ঘন জঙ্গল পার হয়ে আসার সময় হরেশবাবুর সাথে দেখা। সে ঠিক রমিজের মামাবাড়ির দিকে কোথায় যেন কাজে যাচ্ছে। হরেশবাবু সাঁইডুলি নদীর খেয়া ঘাটের মাঝি। ঐ রাস্তা পেরিয়ে আসতে আসতে নদীর কাছাকাছি চলে এলো রমিজ ও তার বাবা। ঘাটের পাশে নদীতীর থেকে বাজার পর্যন্ত ঝোপঝাড়-জঙ্গলের মতো জায়গা। তখনও ঐ ঝোপঝাড় থেকে প্রায়ই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যেত। রমিজদের বাড়ি এই নদী পার হয়ে যেতে হয়। ঘাটে এসে দেখে খেয়া নৌকায় লম্বা অদ্ভুত একজন লোক! সাদা কাপড়ের মতো গায়ে জড়িয়ে প্রায় ঘোমটা দিয়ে বৈঠা হাতে বসে আছে। আর খিল খিল করে হাসছে। রমিজ তার বাবার হাত ধরে নৌকায় উঠে। তারা ভাবছে হরেশবাবুর মতো দেখতে এই লোকটা আবার কে? নৌকা প্রায় মাঝ নদীতে। হঠাৎ হরেশবাবুবেশী লোকটা ঘোমটা খুলে দিয়ে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো। রমিজ ও তার বাবা একটু আগেই যে হরেশবাবুকে তাদের বিপরীত দিকে কাজের উদ্দেশ্যে কোথায় যেন যাচ্ছে দেখে এসেছে; সেই হরেশবাবু কীভাবে হঠাৎ এই নৌকায় এলো! এই ভাবনা ভাবতেই নৌকার এক প্রান্ত থেকে হরেশবাবু একটা হাত বাড়িয়ে দিলো রমিজের দিকে। এতো লম্বা হাত। প্রায় ধরে ফেলবে এমন অবস্থা। রমিজ জ্ঞান হারালো। রমিজের বাবার গা শিউরে উঠলো। হায়! এতো দেখি ভয়ংকর ভূত। কোনো রকম নিজেকে সামলে নিয়ে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরেশবাবু হাওয়া হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বৈঠাটা হাতে নিয়ে নদী পারি দিলো রমিজের বাবা।



বাড়ি এসে রমিজের জ্ঞান ফিরলো। সে ভয়ে আঁতকে উঠলো! তার মনে হলো পিছনে ভূত! রমিজের মা তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে প্রচণ্ড জ্বর!

পরদিন রমিজের বাবা তার এক বন্ধুর সাথে চায়ের আড্ডায় এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বন্ধু অবাক হয়ে বললেন, হরেশবাবু তো এক সপ্তাহ আগে নদীতে ডুবে মারা গেছে! তুই চট্টগ্রাম থেকে অনেকদিন পর বাড়ি এসেছিস! তাই হয়তো জানিস না। এই কথা শুনে রমিজের বাবার ভিতরে বড় রকমের একটা ভয়ের ধাক্কা লাগে!

এর পর থেকে রমিজের বাবা শিশু ছেলেমেয়ে নিয়ে মাঝ রাত্রে কোথাও বেড়াতে যান না।

বাঁশঝাড়ের পেত্নি

এক গহীন জঙ্গলের ভিতর মিরাজ আলী'র বাড়ি। ছোট্ট একটা খড়ের তৈরি ঘর। বউ বাচ্চা সহ চার জনকে নিয়ে সংসার। প্রতি রাতেই তাকে জিলিপি বানাতে হয়। সকালে খদ্দের আসে এবং বাজারে বিক্রি করে চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে। হঠাৎ এক গভীর রাতে জিলিপি বানাতে বসলো। অনেকগুলো জিলিপি বানিয়ে একটা পাতিলে রাখলো। কিছুক্ষণ পর কেমন যেন একটা ভয়ংকর আওয়াজ হলো। মিরাজ আলী এদিক সেদিক তাকালো। কাউকে দেখতে পেলো না। বাইরে আসার পর ঠিক সেই রকম আওয়াজ শুনতে পেল। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেলো না। ঘরের ভিতর ঢুকেই দেখে কে যেন সাদা কাপড় পরে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে জিলিপির পাতিলের কাছে। মিরাজ আলী ভয় পেয়ে গেল! সে চিৎকার করলো কিন্তু আওয়াজ হলো না। ঠিক তখনই ঐ ঘোমটা পরা মহিলা মতো লোকটি ঘোমটা খোলে তার দিকে তাকিয়ে বড় বড় দাঁত বের করে হিঁ হিঁ করে হাসতে লাগলো! মিরাজ আলী চিৎকার করে বললো- ও মাগো এতো দেখি পেত্নি ভূত! সর্বনাশ! মিরাজ আলী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো। ঐ পেত্নিটা তখনি জিলিপির পাতিলটা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। আর একদিন আবার ঐ পেত্নিটা এসে বলে গেলো আমাকে রোজ যেন জিলিপি দেওয়া হয়। তা না হলে কিন্তু আমি সব জিলিপি খেয়ে ফেলবো।

ক'দিন পর। এক রাতে জিলিপি না নিয়েই ঐ জঙ্গলের ভিতর বাঁশঝাড়ের পথ দিয়ে মিরাজ আলী বাহিরে যাচ্ছিলো। হঠাৎ তার পিছনে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুনতে পেলো। কে যেন তার পিছন পিছন আসছে। তাকে তাড়া করছে। সে পিছনে ফিরতেই দেখতে পেলো এক সাদা কাপড় পরিহিতা পেত্নি তার ঘর মটকানোর জন্য বিশাল লম্বা হাত

বাড়ালো। আর বললো- আমার জিলিপি কোথায় হেঁ হেঁ? তারপর থেকে মিরাজ আলী যখনই জিলিপি বানায় প্রথমেই একটা কলাপাতার মধ্যে কতগুলো জিলিপি তার বাড়ির পিছনে জঙ্গলে রেখে আসে। একদিন অমাবস্যার রাতে সে জিলিপি নিয়ে জঙ্গলের দিকে গেলো। অন্ধকারে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে সামনের পথের দিকে তাকালো। তার টর্চের আলোটা গিয়ে ঠিক পেত্রির মুখ বরাবর লাগলো। স্পষ্ট করে দেখে মিরাজ আলী আঁতকে উঠে! সে টর্চের আলোতে তার বউকে দেখতে পেলো! মিরাজ আলীর তখন জ্ঞান হারানোর অবস্থা। খুব কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো। সাহস সঞ্চয় করলো। সে ভাবতে লাগলো যে, তার বউকে তো এই মাত্র ঘরের ভিতর দেখে আসছে। তাহলে মুহূর্তে সে আবার বাঁশঝাড়ের ভিতর আসলো কিভাবে? মিরাজ আলী জিলিপিসহ কলাপাতা রেখে ধীরে ধীরে তার ঘরে ফিরে দেখে তার বউ রাহেলা ঘুমুচ্ছে! মিরাজ আলী তখন রাহেলা রাহেলা বলে হাঁক ছাড়লে কোথা থেকে যেন একটা গোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে আসে। সে ধীরে ধীরে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়। দেখতে পায় তার বউ রাহেলা জিলিপি বানাচ্ছে। তাহলে যে শুয়ে ঘুমুচ্ছে সে কে? নিশ্চয় ভূত-পেত্রি হবে। ভেবেই মিরাজ আলী আবার জ্ঞান হারায়। তার বউ তার চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে পায়ে তেল মালিশ করে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর মিরাজ আলীর জ্ঞান ফিরে। সে তার বউকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে। তখন রাহেলা তাকে বলে ভয় পেয়ো না। আমি আছি তোমার সাথে।

পোড়াবাড়ির পেত্নি

অনেকদিন আগের কথা। পুরান ঢাকার একটি পোড়াবাড়ির কাছে জয়ন্ত'র মাসিমার বাড়ি। ঐ সময় ছিল অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জয়ন্ত বগুড়া থেকে এখানে বেড়াতে এসেছে। তার খুবই ইচ্ছা ঐ পোড়াবাড়িটা ঘুরে দেখা। খুবই জানার আগ্রহ ঐ বাড়িতে কি আছে? মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ঐ বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। সবাই খুলনা চলে গেছে। তবু তার মন মানলো না। চুপি চুপি সেই পোড়াবাড়িটির দিকে এগোতে লাগলো। তার হাতে ছোট একটা টর্চ। যেই বাড়িটির নিকটে এগুচ্ছে তখনই ধূপ ধূপ আওয়াজ ভেসে এলো। ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ। মেয়েদের চুড়ি নাড়ার শব্দ। যখনই জয়ন্ত থমকে দাঁড়ালো তখন সেই শব্দও থেমে গেলো। আর একটু কাছে এগুতেই দেখতে পেলো জানালার ফাঁক দিয়ে একজন মহিলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজুগুজো করছে। সকল দরজাই বন্ধ। যেই জয়ন্ত ঐখান থেকে ফিরে আসতে পা বাড়ালো ঠিক তখনই মহিলাটি হাত দিয়ে ইশারা করলো। ঐদিকে আসো। জয়ন্ত'র মনে পড়লো তার মাসিমার কথা। তিনি বলছিলেন যে, ঐ বাড়িতে কেউ থাকে না। তাহলে উনি কে? ঐ বাড়ির ভিতরেই বা সে যাবে কিভাবে? সবগুলো দরজাইতো বাহির থেকে তালা দেওয়া। উত্তর পাশে যেতে ইশারা করলো মহিলা। জয়ন্ত ভাবলো ঐ পাশে বোধ হয় দরজা খোলা আছে। যাই ওদিকে। গিয়ে দেখে সেই দিকেও দরজা বন্ধ। একটা মিষ্ট গন্ধও ভেসে এলো। হঠাৎ আচমকায় মৃদু আওয়াজ হয়ে একটা দরজা খুলে গেলো। জয়ন্ত ভিতরে ঢুকলো। ঐ মহিলাটি এক কোনের একটা খাটের মতোন সেখানে বসার জন্য ইশারা করলো। জয়ন্ত খাটের দিকে চোখ ফিরাতেই দেখতে পেলো মহিলাটির পোশাক পরিবর্তন হয়ে গেলো। মুহূর্তেই এ কি করে সম্ভব হলো? জয়ন্ত খানিক ভাবলো। অতঃপর দেখতে পেলো একটি মহিলা

কঙ্কালসার অবস্থায় মুখ হা করে শুয়ে আছে। শরীর পুরোটা শিকল দিয়ে বাঁধা। ওর ঠোঁটের কষে রক্ত ধারা বইছে। জয়ন্ত'র শরীর ভয়ে শিউরে উঠলো। 'ও মাগো' বলে চিৎকার করলো... কিন্তু কোনো আওয়াজ হলো না। পাশে তাকাতেই দেখলো ঐ জীবিত মহিলাটি আর নেই! জয়ন্ত নিজেকে বাঁচানোর জন্য পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো দরজাই খোলা পেলো না।

মাসিমা জয়ন্তকে খুঁজতে খুঁজতে ঐ পোড়াবাড়িটির দিকে এলো। তখন রাতের আঁধারও আরো ঘনিভূত হচ্ছে। অল্প আলোর একটা টর্চলাইট হাতে। চারিপাশ তখন নিরব নিস্তব্ধ। বাড়িটির কাছাকাছি আসতেই একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পায় মাসিমা। ভয়ে আঁতকে উঠেন তিনি। কোথাও কেউ নেই। তাহলে জয়ন্ত এত রাতে গেলো কোথায়? হঠাৎ নজরে পড়ে বাড়ির পাশের তেঁতুল গাছটার উপর। কে যেন শব্দ কিছু একটা চিবিয়ে খাচ্ছে। স্পষ্ট করে দেখে মাসিমা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে!

রাঙামাটির ভূত

বহুদিন আগের কথা। তমাল তার দুজন বন্ধু মিলে রাঙামাটি থেকে ফিরছিলো। শহর থেকে বের হতে হতে প্রায় মধ্যরাত। ছোট বাস। তারা ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। পথে বেশ কয়েকটা স্টপেজ থেকে যাত্রী উঠা-নামা করার কথা। কিন্তু সেদিন কোনো যাত্রী পাওয়া গেলো না। ঘন জঙ্গল ঘেঁষা রাস্তা। কিছু দূর যাওয়ার পর এমন একটি স্থানে বাসটি হঠাৎ থামালো ড্রাইভার, যেখানে এই বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারিপাশ নিরব-নিস্তব্ধ। তমাল সামনের দিকে তাকালো। দেখতে পেলো সাদা আলখাল্লা পরা দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে বাসের অল্প আলোতে তাদের মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তাদের একজনের হাতে ঘাড় মটকানো একটি বাচ্চা। তারা ড্রাইভারকে বললো সামনে জঙ্গলের কাছে শ্মশানে নামিয়ে দেওয়ার জন্য। ড্রাইবার সহ তমালরাও ভয় পেয়ে গেল। তারা বাসে উঠে এলো। ড্রাইভারের কাছে বাসটা কেমন ভারি হয়ে উঠলো। বাসের গতি যতই বাড়ায় কিন্তু সামনের দিকে তেমন যাচ্ছে না। রাতের বাস তাই যাত্রীদের আরামের জন্য ভিতরের লাইটগুলো সব বন্ধ করা। বাসের এত সিট থাকতে অদ্ভুত লোকগুলো গিয়ে বসলো একেবারে পিছনের সিটে। ততক্ষণে তমাল ও তার বন্ধুদের কাহিল অবস্থা। তাদের গা ভয়ে শিউরে উঠছে। হঠাৎ শুনতে পেলো পিছনের সিট থেকে চিবানোর শব্দ। হায়! পিছনে তাকিয়ে দেখে তমাল। অদ্ভুত লোকগুলো ঘাড় মটকানো বাচ্চাটাকে কামড়ে কামড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে! তার গা হিম হয়ে আসে। বাসটা ততক্ষণে শ্মশানে চলে এসেছে। ড্রাইভার অদ্ভুত লোকগুলোকে নামতে বললো। তারা তখন যাত্রীদের দিকে তাকালো। বললো আজকের মতো তোরা বেঁচে গেলে।

বাস তখন আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোচ্ছে। চারিপাশ অন্ধকার চেয়ে আসছে। গাড়ির হেড লাইটের আলোতে কোনোরকম সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জানালার ফাঁক দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছু রাস্তা অতিক্রম করার পর হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ হয়। তমাল ও তার বন্ধু ভয়ে আঁতকে উঠে! তারা সামনের দিকে তাকায়। কি যেন যাপসা দেখা যাচ্ছে। ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।

বাস থেমে গেল। ড্রাইভার বাস থেকে নেমে বাইরে এলো। দেখতে পেল চাকা ফাংচার হয়ে গেছে। এমন এক জায়গায় এসে বাসটি থেমেছে যেখানে কোনো লোকালয় নেই। নেই কোনো আলো। দুপাশেই ঘন জঙ্গলে আবৃত। সরু রাস্তার সামনেও ঘন অন্ধকার। বাসের ভিতর তমাল ও তার বন্ধুরা চুপচাপ বসে আছে। ভৌতিক একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় থেকে যেন একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, তোরা পালা! এখান থেকে দ্রুত পালা! এখানে ভূত আছে! ড্রাইভার বাইরে থেকে দৌড়ে বাসের ভিতর প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তমাল ড্রাইভারের সাথে কথা বললো, আমার খুব ভয় লাগছে। এখন কি করা? আমরা এখন পালাবো কোথায়? এই পাশের জঙ্গলটা বোধ হয় ভালো নয়। সম্ভবত ভূত-পেঙ্গি রয়েছে। তা না হলে এমন আওয়াজ আসবে কোথেকে। এ তো সাধারণ মানুষের কণ্ঠ বলে মনে হয় না। ড্রাইভার বললো, আজ রাতটা এই বাসের ভিতরই কাটাতে হবে। সামনে কোথাও লোকালয় নেই। বাসের ভিতর অতিরিক্ত কোনো চাকাও নেই যে গাড়ি চালাতে পারবো। ভাবছি কি করা যায়। তমাল জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো একটা মাইক্রো বাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারা বাস থেকে বের হতেই ঐ মাইক্রো থেকে একজন লোক বের হয়ে বললো, আপনারা বোধ হয় বিপদে পড়েছেন। চলেন আমার সাথে। আপনাদেরকে পৌঁছে দেই। তারা কিছুক্ষণ ভেবে মাইক্রোর ভিতরে প্রবেশ করলো। বাসটি হঠাৎ করে জঙ্গলের দিকে মোড় ঘোঁরায়। তমাল বললো, জঙ্গলের দিকে যাচ্ছেন কেন ভাই? ড্রাইভার লোকটি বললো, আপনারা কি ভাবছেন আমি সাধারণ কোনো মানুষ? এ কথা শুনে



তমাল ও তার বন্ধুরা একে অপরের দিকে তাকায়। তারা কিছুটা ভয়ও পায়। তারা ভাবে তাহলে উনি কে? এই লোকটি আবার জানলোই বা কি করে যে আমরা বিপদে পড়েছি। কি এক অদ্ভুত কাণ্ড! লোকটি এক গহীন জঙ্গলের ভিতর বাস নিয়ে প্রবেশ করলো। জঙ্গলের ভিতর দিয়েও আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা চলে গেছে বহুদূর। তমালরা এক অজানা আশঙ্কায় বসে আছে বাসের ভিতর। কোথায় যাবে কি করবে কিছুই তখন ভেবে পাচ্ছে না তারা।

ভূতের আগমন

রমিজ মামা কিছুক্ষণ হলো বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। বাড়ির সব বাচ্চারা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। বাচ্চারা বলতে শীলা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, অহনা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে, বন্টু তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। রমিজ মামার সব গল্পেই ভূতের আগমন ঘটে। রাত যত গভীর হয় গল্পেও তত ভূত আসতে থাকে। বাচ্চারা সবাই রাতের খাবার খেয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে গল্প শুনার। এদিকে রমিজ মামাও খাবার খাওয়ার জন্য ডাইনিং টেবিলের দিকে যাচ্ছেন। পারিবারিক কিছু গল্প করে বাচ্চাদের সাথে গল্প করতে তৈরি হয়ে নিচ্ছেন। রমিজ মামা বললেন, তোমরা কি আজ ভূতের গল্প শুনবে না কি অন্য গল্প? সকলেই এক যুগে বলে উঠলো- ভূতের গল্প।

রাবেয়ার বাচ্চা হয়েছে ক’দিন হলো। এক রাতে রাবেয়া তার বাচ্চা নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। জানালা খুলাই রয়েছে। তার একটু তন্দ্রা ভাব চলে আসে। বাচ্চাটাকে পিছনে রেখে সে ঘুমিয়ে পরে। হঠাৎ করে সে শুনতে পায় কে যেন বলতে লাগলো, ঐ রাবেয়া তোর বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে দে! তা না হলে আমি তোকে মেরে ফেলবো। রাবেয়া ভয়ে তার বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে। তার পর থেকে আর রাবেয়া বাচ্চাকে পিছনে রেখে ঘুমায় না।

এক রাতে রাবেয়ার স্বামী ছোবান সাহেবের ঘুম ভাঙে ঘরের বাইরের একজনের ডাকে। সে আর কেউ নয় তার বন্ধু আহসান। বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ছোবান সাহেব ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা রাখার পূর্বে ভাবলো এতো রাতে আহসান আবার এলো কোথেকে? আহসান তো দেশের বাইরে থাকে। আহসান বললো, কিরে দোস্ত কি ভাবছিস? বাইরে চলে আয়। আহসান ছোবানকে নিয়ে বাড়ির দক্ষিণ পাশের পুকুর



পারে নিয়ে যায়। আহসানকে দেখার জন্য ছোবান সাহেব অন্ধকারে টর্চের আলো ঠিক আহসানের মুখ বরাবর ধরে। আহসানের মুখ দেখে ছোবান সাহেব আঁতকে উঠে। হায় এতো আহসান নয়। কি এক বিশি চেহারার লোক। ভূতের মতো মনে হয়। তার পর ঐ লোকটা হি হি হি করে ছোবান সাহেবের দিকে একটা লম্বা হাত বাড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোবান সাহেব ভয়ে জ্ঞান হারালো। বাচ্চারা বলতে লাগলো পরে কি হলো? মামা বললেন তোমরা একটু বসো, আমি একটা সিগারেট খেয়ে আসি। বাচ্চারা বললো মামা তুমি সিগারেটটা এখানেই খাও। মামা বললেন, না। বাচ্চাদের সামনে সিগারেট খাওয়া উচিত নয়। তারপর মামা বারান্দায় গেলেন ধূম সেবন করার জন্য। কিছুক্ষণ পর মামা এসে আবার বসলেন। পরদিন সকালবেলা ছোবান সাহেবের জ্ঞান ফিরলো।

ক'দিন পর আবার মাঝ রাত্রে ছোবান ছোবান বলে কে যেন ডাকতে থাকে। ছোবান সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দরজা খুলে পা বাড়ান বাইরে। আহসানের গলার আওয়াজ- ভয় পাসনে ছোবান। আমি আহসান। তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ছোবান সাহেবের সন্দেহ হয়। ঐ রাতের মতো আবার কিনা একই ঘটনা ঘটে। তিনি সাহস করে এর রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। ছোবান সাহেব অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে দেখেন আহসানের সেই বিশি চেহারা। ভূতের রূপ। ছোবান সাহেব সেদিন আঁতকে না উঠে তাকে ফিরে যেতে বলে তিনি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পরেন এবং তাকে পরদিন সন্ধ্যায় আসতে বলেন। পরদিন সন্ধ্যায় আহসান প্রবেশ করে ছোবান সাহেবের বাড়িতে। ছোবান সাহেব তাকে সোফায় বসতে বলে রান্না ঘর থেকে চা নিয়ে এসে তাকে খেতে বলে। চা খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আহসান ঢলে পরে সোফার নিচে মেঝেতে। বাচ্চারা বললো, আহসানের কি মৃত্যু হলো? মামা বললেন, হ্যাঁ। তারপর ছোবান সাহেব নিজেই রাতের মধ্যেই আহসানের ডেড বডিটা বাড়ির পিছনে মাটি খুঁড়ে মাটিচাপা দিয়ে রাখেন। ছোবান সাহেব এবার



শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। এবার আর কেউ মাঝ রাত্তে তার ঘুম ভাঙিয়ে ঘরের বাইরে যেতে বলবে না। আর কেউ এখন ভূতের ভয়ও দেখাবে না।

বেশ কিছুদিন পর ছোবান সাহেব খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ভ্রমণ করে বাড়িতে প্রবেশ করেন। বাড়িটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে। কোথাও কেউ নেই। কেবল সন্ধ্যা হয়েছে। তারপরও ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করছে। তিনি রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাতে গেলেন। ঠিক মাঝরাত্তে একটা নাকি স্বরের আওয়াজে ছোবান সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি শুনতে পান ঘরের বাইরে থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। ছোবান ছোবান আমি এসেছি। তুই বাইরে চলে আয়। ছোবান সাহেব বাইরে এসে দেখেন আহসান বসে আছে বাগানের রাখা তার ইজি চেয়ারটায়। ছোবান সাহেব ভয়ে জ্ঞান হারানোর অবস্থা। তার শরীর ঘামছে। তিনি ভাবছেন যাকে সেদিন মাটি চাপা দিয়ে আসলাম। সে কিভাবে আবার এখানে চলে আসলো? এসব চিন্তা করা অবস্থায় পিছন থেকে কে যেন তার ঘারে হাত রাখলো। ছোবান সাহেব বুঝে উঠার আগেই তার ঘার মটকে গেলো। ঘড়ির কাঁটা তখন টিক টিক করে চলছে। রাতের গভীরতায় অমাবস্যার অন্ধকারও আরো কালো হয়ে যাচ্ছে। এখন সময় হয়েছে ঘুমাবার। বাচ্চাদেরকে ঘুমাতে বলে মামা এবার ঘুমাতে গেলেন।

কক্ষ নং এক'শ তেরো

বৃষ্টি হচ্ছে। টুটুল একটা ব্রিফকেস হাতে নিয়ে যাত্রী ছাউনিতে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্য রাত তখন। রাস্তায় কোনো গাড়ির চলাচলা নেই। লোকজনের হাঁটা চলাও নেই। হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন একটা প্রাইভেট কার এখানে থামতে দেখে টুটুল তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এলো। তারা টুটুলকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই এখানে কি কোনো থাকার হোটেল পাওয়া যাবে? আমাদের গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেছে। আশেপাশে কোনো পেট্রোল পাম্পও দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া আমাদের কাছে কোনো টাকাও নেই। মানিব্যাগটা হারিয়ে ফেলেছি। টুটুল বললো, হোটেল তো এখান থেকে অনেকটা দূরের পথ। কাছেই একটা পুরোনো বাড়ি আছে। চাইলে এখানে রাতটা কাটাতে পারেন। আর ঐ যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন সেই বাড়ির ভিতর একশ তেরো নম্বর কক্ষ থেকে একটি হিরার ব্রিফকেস উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারলে আপনাদেরকে আমি এক কোটি টাকা দেবো। রাজি থাকলে এম্ফুগি চলুন। যান নিয়ে আসেন ব্রিফকেসটি। গাড়ির চার জন লোকই দেখতে তরুণ। মনে হচ্ছে তারা বেকার। তাদেরও প্রচুর টাকাপয়সা দরকার। তারাও ভাবতে লাগলো, কি করা যায়। টাকার লোভ সামলানো কঠিন! তারা কিছুক্ষণ ভেবে রাজি হয়ে গেলো এবং ক্রমান্বয়ে একজন একজন করে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে লাগলো। প্রথমে একজন প্রবেশ করে। সাথে একটা টর্চ লাইট নিয়ে যায়। কারণ এ বাড়িতে কোনো বিদ্যুতের সংযোগ নেই। কক্ষে প্রবেশ করতেই একটা বিকট আওয়াজ বের হয়ে আসে। তারপর একটা গোঙানির শব্দ। মনে হচ্ছে ভিতরে কেউ আছে। প্রথম লোকটি যেই ব্রিফকেসের কক্ষে পা রাখে ঠিক তখনই পিছন থেকে তার ঘারে ভারি একটা কিছু খামচে ধরে। লোকটি পিছনে তাকাতেই দেখে এক ভয়ংকর দানব। তার নখ বড় বড়। লোকটি চিন্তা করার



আগেই দানবটি তার ঘার মটকে ফেলে। একটা ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গেলো। আর বাকি যারা ঘরে প্রবেশ করেছিলো তারাও আর বের হতে পারছে না। সকল দরজাই আচমকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা পালানোর চেষ্টা করলো কিন্তু পালাতে পারলো না। ঐ ভয়ংকর দানবের কবলে পড়ে মারা পড়লো। কথায় আছে অতি লোভে তাতি নষ্ট। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। এখানে তাই ঘটলো।

টুটুলও এই কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে এখন অন্য লোকদের মাধ্যমে কাজটা করার চেষ্টা করেছে। টুটুলও একবার ঐ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তার হাতে পিস্তল থাকায় দানবের সাথে লড়াইতে পেরেছিল। কয়েক দপা পিস্তলের গুলির আঘাতে দানবের হাত পা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু টুটুল যখনই বেরুবার চেষ্টা করছিলো পিছন থেকে আচমকা একটা শক্ত হাত এসে তাকে ধরে ঘাড় মটকানোর চেষ্টা করে। দানবের ভাঙা হাত পা কিছুক্ষণের মধ্যেই জোড়া লেগে যায়। অদ্ভুত কাণ্ড। টুটুলের প্রচণ্ড শক্তি থাকায় দানবের হাতটা তার ঘাড় থেকে সড়াতে সক্ষম হয়েছিল। তৎক্ষণাত আবার দানবের শরীরে গুলি ছুঁড়ে। দানবের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। তার শরীর ভেঙে চুরমার হয়ে আবার কিছুক্ষণের মধ্য জোড়া লেগে যায়। এভাবে প্রায় ঘণ্টা চারেক যুদ্ধ করে একটা পা ভাঙা অবস্থায় কোনো রকম বেঁচে বের হতে সক্ষম হয়েছিলো টুটুল। সেই এক পা ভাঙা অবস্থায় প্রতিনিয়ত শক্তিশালী কোনো লোক সন্ধানে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ যদি পারে ঐ বাড়ির ভিতর থেকে হীরা ভর্তি ব্রিফকেসটা উদ্ধার করতে। সেই অপেক্ষায় টুটুল নিঃশ্বাস রাত কাটাচ্ছে।

হঠাৎ এক রাতে ক্লান্ত টুটুল ঐ বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা নির্জন স্থানে গিয়ে দেখতে পায় ছোট্ট একটা কুঠির। সেই কুঠিরের ভিতর প্রবেশ করে। কোনো লোকজন নেই। চারিপাশ নিরব নিস্তব্ধ। কুঠিরের বারান্দায় একটা ইঁজি চেয়ারও রয়েছে। মনে হচ্ছে কেউ না কেউ আছে। হয়তো বা রাতের বেলায় এখানে থাকে না। কোথাও বিচরণ করে। ইঁজি চেয়ারটায় আরাম করে বসে টুটুল। ক্লান্ত শরীর। তাছাড়া

অনেক রাত ঘুমায়নি সে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রায় চোখদুটো বুজে যায়। হঠাৎ সে স্বপ্নে দেখে ঐ ভূতের বাড়িতে একশ তেরো নং কক্ষের ভিতর ঢুকার বাঁপাশে একটা ছোট বাক্স আছে। সেই বাক্সে কতগুলো কাপড়চোপড় রয়েছে। সেই কাপড়চোপড়গুলো যদি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা যায় তাহলে ঐ ভূতও মরে যাবে। অথবা আরেকটা সহজ পদ্ধতি আছে। তার জন্য একজন সাহসী শক্তিশালী লোক দরকার। ঐ বাক্সের পাশেই একটা তলোয়ার রয়েছে। সেই তলোয়ার দিয়ে যদি প্রথমে ডানে তারপর বাঁয়ে দুটি কোপ দেওয়া যায় তাহলে ঐ ভূত মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাবে। তাহলে তুমি সহজেই হিরার ব্রিফকেসটা উদ্ধার করতে পারবে। তবে সাবধান! কক্ষে প্রবেশ করার সময় খুব সাবধানে এগোতে হবে। যাতে কোনো প্রকার আওয়াজ না হয়। হঠাৎ ধরপর করে টুটুলের ঘুম ভেঙে যায়। তার সামনে দেখতে পায় সাদা আলখাল্লা পরিহিত একটা লম্বা মতো লোক। সে কোনো কথা বললো না। ইশারায় তাকে এখান থেকে চলে যেতে বললো। টুটুল তার কাছে রাখা টাকার ব্রিফকেসটা নিয়ে ওখান থেকে বের হলো।

পরদিন রাত। সে নিজেই ঐ ভূতের বাড়িতে প্রবেশ করলো। তলোয়ারের আঘাতে ভূতকে পরাজিত করে হিরার ব্রিফকেসটি উদ্ধার করে বেরিয়ে এলো। যখন ব্রিফকেসটা খুললো ঠিক তখনই তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসলো একটা ভয়ংকর দৈত্য। টুটুল ভয়ে আঁতকে উঠলো!

দেয়ালে ভূত দেখা

অজয়দের বাড়িটা নিরব নিস্তব্ধ। বাড়ির আঙিনায় শ্যাওলা কাদায় ভরে গেছে। দেয়ালে ময়লা জমে আছে। পরিত্যক্ত বাড়ির মতোই দেখায়। অজয় তার বাবা সহ বেশ ক'বছর হলো নিরুদ্দেশ। পাশের বাড়ির কাজল অজয়ের বাল্য বন্ধু। অজয়ের কথা মনে হলে তার খুব মন খারাপ হয়। একসাথে খেলা করা সহ পুকুর পাড়ে বসে আড্ডা দেওয়ার কথা মনে পড়ে! হঠাৎ এক রাতে কাজলের বাবা বললো, অজয়ের বাবাকে আজ বাজারে দেখে এলাম। তারা আজই বাড়ি এসেছে। চেহারাটা কেমন জানি হয়ে গেছে। কথাও বলে না সহজে। কাজল একথা শুনে ভাবলো, তাহলে তো অজয়ও সাথে এসেছে। কত দিন তার সাথে দেখা হয় না। যাই তার সাথে দু'একটা কথা বলে আসি। কোথায় গিয়েছিল সে জিজ্ঞেস করে আসি। কাজল তার মা'কে বলে অজয়দের বাড়ির উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়। অমাবস্যার রাত। চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাথে একটা টর্চ নিলো কাজল। বাড়ির কাছে গিয়ে অজয় অজয় করে হাঁক ছাড়লে অজয়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। তাদের বাড়িটাও নিরব। মনে হচ্ছে বাইরে থেকে তালা দেওয়া। কাজল যখন সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য পা বাড়ালো ঠিক তখনই অজয়ের ডাক! কিরে কাজল কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে আয়। একথা বলে অজয় নিজেই কোথা দিয়ে জানি বের হয়ে এলো। অজয়ের মুখটা শুকনা শুকনা লাগছে। কেমন যেনো হয়ে গেছে। কাজল অজয়ের মুখটা ভালো করে দেখার জন্য তার টর্চটা জ্বালালো এবং তার মুখের দিকে ধরলো। অজয়ের চেহারা স্পষ্ট করে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে! কি একটা অদ্ভুত বিশি চেহারা। ভূতের মতো মনে হচ্ছে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে! তাকে জিজ্ঞেস করে, কিরে তোর চেহারা এমন হলো কি করে? অজয় বলে আমি তো আগে থেকেই এমন ছিলাম। তুই

বোধ হয় আমাকে আগে কখনো এভাবে ভালো করে দেখিস নি। অজয় তার দুহাতে কাজলের একটা হাত ভালো করে ধরে বলে, কত দিন পর তোর সাথে দেখা। অজয়ের হাতদুটো খুবই ঠান্ডা। মনে হয় ফ্রিজ থেকে উঠে এসেছে কেবল। কাজল তার মায়ের কাছে শুনেছিলো ভূতদের হাত নাকি খুব ঠান্ডা হয়। তারপর বাড়ি ফিরলে কাজলের জ্বর হয়। জ্বরের ঘোরে দেয়ালেও ভূত দেখে। ভূত তাকে তাড়া করে। সে আঁতকে উঠে তার মা'কে জড়িয়ে ধরে। সুস্থ হওয়ার পর রাতের বেলা একা একা আর কোথাও যায় না কাজল।

আজব ভূত

রমিজ উদ্দিন তার বোনের বাড়িতে বেড়াতে আসতেই বাচ্চারা তাকে ঘিরে ধরলো। রমিজের আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। বাচ্চারা বলতে লাগলো, মামা আজ গল্প শুনাতে হবে। কত দিন তোমার গল্প শুনি না। রমিজের বোন বললো, তোরা এখন একটু থাম। রমিজ কেবলই এসেছে। একটু বিশ্রাম করুক। ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে তার পর আয়েশ করে তোদের গল্প শুনাবে। এখন তোরাও হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বস। আমি খাবার নিয়ে আসছি। এদিকে রমিজ উদ্দিনও হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো। বাচ্চাদের সাথে রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় গিয়ে বসলো।

মামা বললো, আজ কি গল্প শুনাবো? হাসির না কি ভূতের? বাচ্চারা এক বাক্যে বললো, ভূতের। রাত বাড়ার সাথে সাথে ভূতের গল্পও বেশ জমে। রাতের নীরবতার সাথে সাথে রমিজ উদ্দিনের গল্পেও ভূতের আগমন ঘটতে থাকে।

শীতের রাত। বাইরে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরেও খুব ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। প্রত্যেকেই কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে আছে। মামা গল্প বলতে শুরু করলো, মামা বললো আজ তোমাদের একটি পুরোনো দিনের ভূতের গল্প শুনাবো। আমি তখন মেট্রিক পরীক্ষা শেষ করেছি। ভাবলাম দূরে কোথাও থেকে কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসি। মা'র কাছে বললাম, কোথায় যাওয়া যায় বলতো। মা বললো, একটা কাজ কর, তোর খালার বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। খালাকেও দেখে আসলে আর তোর সময়টাও কাটলো।

পরদিন রাতে তিন বন্ধু মিলে বাসে রওয়ানা দিলাম খালা বাড়ির উদ্দেশে। পাহাড়ি আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে বাস চলছে। অমাবস্যার রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালা দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড ঠান্ডাও লাগছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশাও বেড়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে বাসটি হঠাৎ এক বিকট আওয়াজ হয়ে থেমে গেলো। চাকা পাংচার। জানতে পারলো যে সামনের ব্রীজটি আচমকায় ভেঙে গেছে। হঠাৎ করে দেখতে পেলাম সামনে থেকে কারা যেন মশাল জ্বালিয়ে বাসটির দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ওদেরকে ডাকাত ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু তারা বলতে লাগলো যে, আপনারা ভয় পেয়ে না। আমরা আপনাদের উদ্ধার করতে এসেছি। এর আগেই বাসের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিলো বাস কন্ডাকটর। জানালার কাচ ভেদ করে দেখা গেলো খালার বাড়ির বাবুল মিয়াকে। যে লোকটি অনেক বছর যাবৎ খালার বাড়িতে ভূত্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তাকে দেখে জানালা খুলে ডাকতে শুরু করলাম। বাবুল মিয়া ফিরে তাকাল। সে বললো, আসুন রমিজ ভাই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আমি তখন বন্ধুদের নিয়ে বাবুল মিয়ার সঙ্গে খালার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই ভাঙা ব্রিজ। এই ব্রিজ দিয়ে কোনো রকমে লোকজন হেঁটে যেতে পারে। কিন্তু কোনো যানবাহন চলাচল করা নিষেধ। ব্রিজের মাঝামাঝি যাওয়ার পর পিছনে তাকিয়ে দেখলাম যে বাবুল মিয়া কোথাও নেই। আমরা কোনো রকমে ব্রিজটি পাড়ি দিলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো ব্রিজের মাঝামাঝিতে। দেখতে পেলাম বাবুল মিয়া তার একটা লম্বা হাত দিয়ে ব্রিজের উপর থেকে নদী থেকে কাঁচা মাছ ধরে খাচ্ছে! আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। আমরা অনেকটা দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করি। অবশেষে খালার বাড়ি পৌঁছতে সক্ষম হই।

রাতের খাবার খাওয়ার পর খালার সাথে ব্যপারটা খুলে বললাম। খালা বললেন, বাবুল মিয়া তো বছর দুয়েক আগে ভরা জোয়ারে নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা ডুবে

মারা গেছে। নদীতে যখন ইলিশ মাছ ডিম পাড়ার জন্য আসে তখন বাবুল প্রায়ই সেই মাছ ধরে নিয়ে আসে। তারপর সে মাছের ডিম খাওয়ার জন্য অস্তির হয়ে পড়ে। খালা বললেন, আমি তাকে প্রায়ই বুঝিয়ে বলেছি যে, এ সময় ইলিশ ধরতে নেই। তখন তার ডিম পাড়ে অসংখ্য ইলিশের জন্ম দেয়। কিছুদিন অপেক্ষা করলে আমরা আরো বেশি বেশি ইলিশ খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সে আমার কথা কখনেই শুনেনি। তাছাড়া সে কারেন্টের জাল দিয়েও মাছের পোনা ধরে নিয়ে আসতো। আমি তাকে বারণ করেছি। কিন্তু বলে এ সময় মাছের পোনা খেতে খুব মজা। খালার কথা শুনে ভয়ে আমার গা শিউরে উঠে! কাঁপতে থাকি। আর কোনো কথা বলতে পারি না। আমার বন্ধুদেরও একই অবস্থা!

বাচ্চারা বলতে লাগলো, তারপর কি হলো মামা?

মামা কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বললো, তারপর ফ্রেশ হয়ে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেলাম।

জলের ভূত

আফিজ উদ্দিন মামা বাড়িতে প্রবেশ করতেই বাচ্চারা তাকে ঘিরে ধরে। মামার গল্প শুনার জন্য রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় বসলো উর্মি, অনিলা ও সাজ্জাদ। মামা বললো, কি গল্প শুনতে চাও? ভূতের নাকি হাসির? তারা এক কথায় বললো, ভূতের! মামা আয়েশ করে বসে ইজি চেয়ারটায়। তোমাদেরকে নিয়ে সেদিন নৌকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম যে নদীতে তার নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গার জল একসময় খুবই স্বচ্ছ ছিলো। প্রাচীনকালে এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে সভ্যতা ঢাকা নগরী; যা বর্তমান রাজধানী শহর। নদীতীর ঘেঁষে যখন ধীরে ধীরে একতলা দুতলা বাড়িঘর উঠতে শুরু করলো লোকজন পারাপারের জন্য খেয়া নৌকার ব্যবস্থা করলো। মুঘল আমলে এই নদীতে কাঠের সেতু ছিল। নদীতীরে অবস্থিত ঢাকা নগরী রাজধানী হওয়ার সাথে সাথে দিনে দিনে ঘনবসতি হয়ে উঠলো। তারপর বড় বড় উঁচু ইমারত গড়ে উঠতে শুরু করলো।

একসময় লোকজন গোসল করতো অনায়াসে। এমন স্বচ্ছ জল ছিলো যে লোকজন পানও করতো। স্বচ্ছ জল দেখে মুগ্ধ হয়েছিল ইংরেজরাও। ঘনবসতি হওয়ার সাথে সাথে লোকজন ক্রমশ ঢাকার সকল ময়লা-আবর্জনা ফেলে বুড়িগঙ্গাকে একটা ডাস্টবিনে পরিণত করেছে। সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে নোংরা ভূত।

অমাবস্যার রাতে রমিজ নামের এক লোক বুড়িগঙ্গা তীর ঘেঁষা এক পরিত্যক্ত বাড়ির ছাদে ঘুমানোর জন্য সন্ধ্যার পর পরই হোটেল থেকে খেয়ে এসে একটা চট বিছিয়ে এক ইটের উপর মাথা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলো। প্রায় ঘণ্টা চারেক ঘুমানো। হঠাৎ করে কে যেন তার গলা চেপে ধরলো। বহু চেষ্টা করে সে ছাড়া পেলো। রমিজ ঘেমে গেলো। সে ভাবলো এখানে কিছু একটা আছে হয়তো। তা না হলে এভাবে কে আবার

তাকে ধরবে। সে ভয়ে রাতে আর ঘুমালো না। চুপ করে শুয়ে রইলো। হঠাৎ করে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এলো। রমিজ আঁতকে উঠলো সামনের দিকে তাকিয়ে। সাদা আলখাল্লা পরা একটা লম্বা মতো লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। মধ্যরাত তখন। রমিজ একা কি করবে তখন ভেবে না পেয়ে স্থির হয়ে রইলো। হঠাৎ তার পিছন থেকে কে যেন বলছে রমিজ ওখান থেকে পালা। তুই মারা পরবে। ওখানে কোনো মানুষ থাকে না। সব নোংরা ভূত। রমিজ কোনো উপায় না পেয়ে মন্তবের পড়া সূরা পাঠ করতে লাগলো। তারপর তাকিয়ে দেখে ঐ লোকটি আর নেই। ভূত-প্রেত হবে হয়তো।

পরদিন রাতে ওখানে আর ঘুমালো না। সে নিচের তলায় একটি কক্ষে গিয়ে ফ্লোরে একটি চট বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। প্রচণ্ড গরমে রমিজ সে রাতে দরজা খুলেই ঘুমালো। হঠাৎ করে একটা ধমকা হাওয়া ভেসে এলো। হাওয়ায় ভেসে এলো বুড়িগঙ্গার পচা গন্ধ। সাথে সাথে রমিজের ঘুম ভেঙে গেলো। সে দেখতে পেলো একটা বিশি চেহারার লোক বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। তার শরীর ময়লায় আবৃত। সম্ভবত বুড়িগঙ্গা থেকে উঠে এসেছে। সে তখন চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু কোনো স্বর বের হলো না।